দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

36

পরীক্ষায় পাস ফেল

সালেহ চৌধুরী

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। চমৎকৃত হওয়ার কিছু নেই, বরং চমকে ওঠার কারণ আছে। পরীক্ষার ফলে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বহুত্রে বড়। সাফল্যকে একটু বাড়িয়ে দেখলে এক-তৃতীয়াংশ বলা যেতে পারে। এমনিতে পাসের হার একত্রিশ দশমিক সাতষট্টি।

এতেও আবার হেরফের আছে। শ্রেণীগত বিভাগের শেষ ধাপটির অবস্থান আদতে সাফল্য-ব্যর্থতার মাঝামাঝি--এপার নদী ওপার নদীর মধ্যবর্তী চরের এই বাশিন্দারা ব্যর্থতার বিড়ম্বনা থেকে আপাত রেহাই পেলেও সাফল্য-সুখের কোন স্পর্শ তাদের ভাগ্যে জোটে না। তবে বিভাগের বিপাকে পা না বাড়িয়ে এ আলোচনায় আমরা যদি এদেরও সফল বলেই ধরে নেই, খুব একটা সান্ত্বনা তাতে মিলবে কি?

এই ফাঁকে বলে রাখা ভালো মনে করি, ঢাকা বোর্ডের ফল বেরুলেও অপর তিনটি বোর্ডের ফল হাতে আসা এখনো বাকি। এ অবস্থায়ও পরীক্ষার ফল পর্যালোচনায় বসার ভরসা একটাই--একের সঙ্গে অপর তিনের খুব একটা তারতম্য হবে না। সাধারণত হয় না। ঢাকা বোর্ডকে তাই প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা সহজেই দেয়া যায়।

প্রায় এক-তৃতীয়াংশে সফল ভাবতে তত কষ্টকর মনে হয় না। একশ' জন তরুণের মাঝে একত্রিশ-বত্রিশজন উচ্চতর শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে পারছে, এমন একটা অবস্থা তৃপ্তিকরই ঠেকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আদত হিসাব নিয়ে। যাতে এই সময়ে একত্রিশ-বত্রিশ সাত-আটেরও নীচে নেমে যায়। এই হিসাবের একটা ব্যাখ্যা রাখা দরকার।

মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীই উচ্চ মাধ্যমিকে বসার সুযোগ পায় না। এইচএসসি'র আগে আছে এসএসসি। কয়েক বছর ধরে এস-এসসি'র সাফল্য মোট পরীক্ষার্থীর সিকি ভাগ ছাড়াতে পারছে না। এই দুটি হিসেবকে এক করলে দেখা যাচ্ছে--উচ্চ মাধ্যমিকের প্রতি পঁচিশ জন একশজন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব করছে। কম করে পঁচাত্তর জনকে আগেই ঝেড়ে ফেলার পর সাফল্যের হার তাই সাত-আটেই দাঁড়ায়।

এ হিসাবকেও অপূর্ণ ভাবা যেতে পারে। দেশের তরুণদের একটা ক্ষুদ্র অংশই তো কেবল মাধ্যমিক পর্যন্ত টিকে থাকার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যেও দুই-তৃতীয়াংশ যদি আবার ফেল করে তাহলে সাফল্যের হিসাব কোথায় দাঁড়ায়!

এমন একটা পরিস্থিতিকে এক কথায় নৈরাশ্যজনক ছাড়া আর কিছু বলার উপায় আছে কি? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাই নতুন করে কিছু ভাবতেই হবে। ব্যর্থতার বহর যখন এমন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে তখন অবশ্যই গোটা ব্যবস্থার গলদ মানতে হবে।

এই গলদটা কোথায় তার কিন্তু হদিসও পরীক্ষার প্রকাশিত ফলেই প্রতিফলিত হয়েছে। ফলের খাতায় 'নাই কলেজ'-এর তালিকাও আছে।

এই 'নাই কলেজ' কলেজের অন-স্তিত্বের দ্যোতক নয়, এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সেইসব কলেজকে যেখানে সাফল্যের হার শূন্য। কলেজ আছে, শিক্ষার্থীও আছে আর তারা যখন পরীক্ষায়ও অংশ নিচ্ছে তখন ধরে নিতে পারি শিক্ষক বা অধ্যাপক সেখানে আছেন, ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব আন্দাজ করার মত তখন সিদ্ধান্ত টানা চলে পঠন-পাঠনও কিছু কিছু ওখানে ঘটে থাকে। আর অতসব কঠিন আয়োজনই যদি সম্ভব হয়, কেউ একজনও পরীক্ষায় সফল হবে না, এ কেমন কথা?

সম্ভবত ধোঁয়া দেখে আগুন আন্দাজ করার এই পুরানো ব্যাপার-টাই এ যুগে অকাল হয়ে গেছে। আয়োজনের ঘটা থাকলেই কাজও কিছু হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যথায় সার্বিক ব্যর্থতার প্রশ্ন আসতো না। এখানে এসেই প্রশ্ন জাগে গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে।

সূচনায় যেটুকু হিসেব কষার চেষ্টা করা হয়েছে তার থেকে এটুকু অন্তত পরিষ্কুট যে এই 'নেই কলেজ' আর 'আছে কলেজের' পার্থক্যও খুব বড় কিছু নয়। গোটা কতক ব্যতিক্রম বাদ দিলে হারের একত্রিশ-বত্রিশ ভাগ হয়ে শূন্যের কাছাকাছিই পৌঁছায়।

পরীক্ষায় সাফল্য বর্থতার এই হার নতুন কিছু নয়। এটাই যেন স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। আমাদের তাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার তাৎপর্য তাহলে কি? সব তরুণই ব্যর্থ (নগণ্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) এ কথা প্রমাণ করার জন্যে প্রমাণ করার জন্যে এই ব্যয় আর আয়াস সাধ্য ব্যবস্থা টেনে চলার সার্থকতা কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাবে সহজেই বলা যায়, শিক্ষার বিস্তার ছাড়া মুক্তির পথ নেই। ফলাফল যাই হোক, চেষ্টা আমাদের তাই চালিয়ে যেতে হবে। এ মতের সঙ্গে আমাদেরও কোন দ্বিমত নেই। আমরা কেবল এর সঙ্গে এটুকু যোগ করার পক্ষপাতী যে চেষ্টার সঙ্গে আরও কিছু বাস্তব সংযোগ ঘটাতে হবে। আর তা হচ্ছে, তরুণ সমাজকে ব্যর্থতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়া নয়--সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়াই হোক সে চেষ্টার লক্ষ্য। নেই কলেজের মত সকল বিড়ম্বনা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে দূর হয়ে যাক।

এমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর যদি দরকার হয়, তাও সই। শিক্ষার নাম করে সময় আর সামর্থ্যের অপচয় অব্যাহত হলে জাতীয় মর্যাদা আর অস্তিত্ব সব কিছুই বিপন্ন হতে বাধ্য।

এই ঢেলে সাজানোর কথা তো সহজেই বলে দেয়া যায়। বলছিও আমরা হরহামেশাই। কাজটা কিন্তু সহজ নয়। হয়ত তাই সব মহল থেকে বলা-কওয়া বিস্তর ঘটলেও কাজ কিছুই হচ্ছে না। কাজের জটিলতা স্বীকার করলে কিছু বিকল্পের কথাও ভাবা উচিত। কেননা, ঢেলে সাজানোর সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অপেক্ষায় অনন্তকাল কেন দুদিন বসে থাকার অবকাশও এক্ষেত্রে নেই।

কি হতে পারে সেই বিকল্প? আমরা মনে করি, আয়োজনের সঙ্গে বাস্তব কাজের বাধ্যবাধকতা ফিরিয়ে আনলেই নেই কলেজ-এর অন্তত বিলুপ্তি ঘটতে পারে। শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনই তাই তার অস্তিত্বের শর্ত। এই শর্তটুকু পুরণ করার উদ্যোগ নেয়া কি একান্তই অসম্ভব?

এই পাস-ফেল ছাড়া আরও একটি সামস্যাকে সামনে এনেছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরিয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, সংখ্যায় যাই হোক, সফল যারা হয়েছে তাদের উচ্চতর শিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে এই এক বছর আগে যারা এ পরীক্ষা পাস করে উচ্চতর শিক্ষার আশায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়ে ছিল তারা আজও ক্লাসে বসার সুযোগও পায়নি। নতুন যারা আসছে তাদের ঠাঁই হবে কোথায়?

গত বছর পাস করা শিক্ষার্থীদের এরই মাঝে পরীক্ষা, ফল প্রকাশ ইত্যাদি মিলিয়ে দেড় বছরের মত কেটে গেল কিংবা জীবন থেকে হারিয়ে গেল মূল্যবান সময়ের একটা বড় অংশ, নতুনদের কত গুণাগার দিতে হবে?

সময়ের এই অপচয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। এমনিতে কারও শিক্ষা জীবনে এক বছর ছেদ পড়লে উচ্চতর শিক্ষার পথে বিস্তর অন্তরায় দাঁড়িয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত ছাড়া ছাড়পত্র মিলে না। ব্যাপারটা যুক্তি ছাড়াও নয়। ছেদ পড়লে পড়াশুনার মন-মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা। অথচ এই যে অকারণ বসিয়ে রাখা, এর কি কিছুই প্রভাব নেই? কিছুই কি করার নেই অসহায় তরুণদের জীবনকে ব্যর্থতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার?